ইসলাম

অ্যা কমপ্লিট কোর্স ফর বিগেনারস

ইয়াহিয়া এমেরিক

অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

৪

(নবিগণের পরিচয়)

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অধ্যায়-১

প্রাচীন সময়ের গল্প

আদম ও হাওয়া (আ.) কে ১৫
নুহ (আ.) ও মহাপ্লাবন ২২
হুদ (আ.) ৩০
ইবরাহিম (আ.)-এর কার্যক্রম ৩৯
তিনজন অজানা নবি ৫৫
ইউসুফ (আ.)-এর গল্প ৫৯

অধ্যায়-২

বনি ইসরাইল

নীলনদ থেকে মরুভূমি ৭৫
মুসা (আ.) ৮৪
পরবর্তী ঘটনাবলি ৯৫
সোলায়মান (আ.) ও বিলকিস ১০৭
দুই শিংয়ের অধিকারী ১১৮

অধ্যায়-৩

ঈসা (আ.)-এর উত্তরাধিকার

ইমরানের পরিবার ১২৭
একজন মহীয়সীর সংগ্রামী জীবন ১৩৫
যে বার্তা রয়েছে ইনজিলে ১৪১
গুহায় ঘুমন্ত যুবকেরা ১৫৭

আদম ও হাওয়া (আ.) কে

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—আমাদের আদি পুরুষদের অভিজ্ঞতা যেমন ছিল।

প্রথম মানুষ

আগে আমরা পৃথিবীতে আগত প্রথম মানুষদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পেরেছি। এটাও জেনেছি—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে ইচ্ছেমতো চলার স্বাধীনতা দেওয়ার আগে এ সুযোগটি বিশ্বজগতের আরও অনেক সৃষ্টিকে দিয়েছিলেন। দায়িত্বের ভার সামলাতে পারবে না; এ আশঙ্কায় তারা কেউ সাহস করেনি।

এরপর আল্লাহ মানুষকে এ দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাব দেন এবং মানুষ তা গ্রহণ করে। তখন আল্লাহ পৃথিবীতে তাঁর খলিফা নিয়োগের ঘোষণা দিলেন।[১] ফেরেশতারা দেখলেন, আল্লাহ মানুষকে চিন্তা ও কাজের স্বাধীনতা দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তারা তখন আশঙ্কা করলেন, মানুষ পৃথিবীতে নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদ সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য আল্লাহ তাঁর কাজের পরিণতি সম্পর্কে ছিলেন পুরোপুরি অবহিত। তাই তিনি ফেরেশতাদের আশ্বস্ত করলেন। জানালেন, খুব শীঘ্রই মানুষকে তাঁদের সিজদা করতে হবে।[২] আল্লাহ মানুষকে পূর্ণ আকৃতি দিলেন এবং তাদের থাকার সুযোগ প্রদান করলেন বেহেশতের একটি জঙ্গলে। একটা সময় প্রথম মানব দম্পতি আদম ও হাওয়া (আ.)-এর বোধোদয় ও জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় জাগ্রত হলো। তখন আল্লাহ তাঁদের চারপাশের পরিবেশকে চিনে নেওয়া ও অনুভব করার সক্ষমতা দিলেন। মূলত এটাই হলো মানুষের আত্মসচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

এরপর আল্লাহ পার্থিব পরিবেশ ও এর উপকরণসমূহ ব্যাখ্যা করার জন্য ফেরেশতাদের নির্দেশনা প্রদান করলেন, কিন্তু ফেরেশতারা কাজটি করতে পারল না। অতঃপর আল্লাহ ফেরেশতাদের সামনেই তুলে ধরলেন তাঁদের তুলনায় আদম (আ.)-এর জ্ঞানের ব্যাপকতা। ফেরেশতারা যেসব উপকরণের নাম বলতে পারেননি কিন্তু আদম (আ.) অবলীলায় বলে দিলেন। ফেরেশতারা এ ঘটনায় বিস্মিত হলেন এবং তাঁরা আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী অবনত হয়ে সিজদা করলেন আদম (আ.)-কে।[৩]

---

[১] সূরা বাকারা : ৩০

[২] সূরা সোয়াদ : ৭১-৭২

[৩] সূরা বাকারা : ৩০-৩৪

মানুষের আগে আল্লাহ আরও একটি জাতি সৃষ্টি করেছিলেন। তারা হলো জিন। এদের মধ্যে একজন ছিল ইবলিস; যে কি না আদম (আ.)-এর সামনে ফেরেশতাদের সিজদা দেওয়ার দৃশ্য অবলোকন করেছিল।[৪] সে ফেরেশেতাদের সাথে দলবদ্ধভাবে সিজদা করা থেকে বিরত ছিল।[৫] আল্লাহ তখন ইবলিসকে প্রশ্ন করলেন—'হে ইবলিস! তোমার কী হলো, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'[৬]

ইবলিস তখন অহংকার ও দম্ভের প্রভাবে কাবু হয়েছিল। তাই অহংকার আর বৈষম্যের তাড়নায় উত্তর দিলো—'আপনি আমাকে আগুন থেকে তৈরি করেছেন আর তাকে তৈরি করেছেন পচা কাদামাটি থেকে।'[৭] অর্থাৎ, ইবলিস নিজে আগুনের তৈরি হওয়ায় সে মাটি থেকে তৈরি আদম (আ.)-কে সিজদা করাটা সঠিক মনে করেনি। আর এটা তার অহংকার ও ঔদ্ধত্যের পরিচয়।

ইবলিস আদেশ অমান্য করায় আল্লাহ তাকে বহিষ্কার করলেন। অথচ বোকা ইবলিস চ্যালেঞ্জ করে বসল স্বয়ং আল্লাহকে। সে কিছু সময় অবকাশ দেওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে অনুরোধ করল, যাতে মানুষকে পথভ্রষ্ট ও বিচ্যুত করতে পারে তার কৌশল দ্বারা। মানুষকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারার মধ্যেই সে সফলতা খুঁজে নিল। ইবলিস মূলত এসব অপকর্মের মাধ্যমে মানুষের তুলনায় জিনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল।[৮]

বস্তুত আল্লাহ তায়ালা এমনই এক সত্তা, যাকে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। কিন্তু ইবলিস সেই ধৃষ্টতা করায় আল্লাহও তাকে সুযোগ করে দিলেন। তিনি ইবলিসকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত আয়ু দান করলেন এবং তাকে সুযোগ দিলেন অবাধে পাপ কাজ করারও।[৯] ইবলিসও বুঝতে পারল—যারা আল্লাহতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, তাদের সে কখনোই পথভ্রষ্ট বা বিচ্যুত করতে পারবে না। অন্যদিকে আল্লাহও জানিয়ে দিলেন, তিনি মানুষের জন্য হিদায়াত প্রেরণ করবেন। এরপরও যারা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআনে ইরশাদ করেন—

> 'যারা আমার বান্দা, তাদের ওপর তোমার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু পথভ্রান্তদের মধ্য থেকে যারা তোমার পথে চলে, তাদের সবার নির্ধারিত স্থান হচ্ছে জাহান্নাম।'[১০]

অন্যদিকে ইবলিস জানাল—সে চারদিক থেকে মানুষকে আক্রমণ করবে এবং মানুষের মাঝে আবেগ ও প্রবৃত্তি সৃষ্টি করে তাকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করবে সত্যপথ থেকে।[১১] আল্লাহ তায়ালা

---

[৪] সূরা কাহাফ : ৩০
[৫] সূরা বাকারা : ৩৪; সূরা হিজর : ৩২
[৬] সূরা হিজর : ৩২
[৭] সূরা আ'রাফ : ১২; সূরা হিজর : ৩২-৩৩
[৮] সূরা হিজর : ৩৯
[৯] সূরা হিজর : ৩৬-৪৩
[১০] সূরা হিজর : ৪২
[১১] সূরা নিসা : ১১৯

তখন ইবলিসকে জানিয়ে দিলেন—যেসব মানুষ ও জিন আল্লাহকে অগ্রাহ্য করে হিদায়াতের পথ ছেড়ে ইবলিসের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তাদের দ্বারাই পূর্ণ হবে জাহান্নাম।[১২]

ইবলিস মনে করেছিল, সে তার চেষ্টায় সফল হবে। কিন্তু সে জানত না, আল্লাহ মানুষকে বেশ কিছু প্রতিরক্ষা সিস্টেম দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। মানুষকে চিন্তার স্বাধীনতা দেওয়ার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা ও যৌক্তিকতাও দেওয়া হয়েছে। তাই গড়পড়তায় সব মানুষই পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

এদিকে আদম ও হাওয়া (আ.) আল্লাহ নির্ধারিত দৃষ্টিনন্দন এক বাগিচায় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। বিশ্রাম, আরাম-আয়েশ ও সন্তুষ্টির সাথে কাটছিল তাঁদের দিনগুলো। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের জন্য কেবল একটিই নির্দেশনা ছিল। আর তা হলো—আল্লাহ তাঁদের বিশেষ একটি গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছিলেন। ওই নির্দিষ্ট গাছের নিচে গেলে তাঁরা জালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে, আর তা হতে পারে সমূহ সর্বনাশের কারণ।

আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ পালনে প্রথমদিকে আদম ও হাওয়া (আ.) উভয়েই ছিলেন এ বিষয়ে খুবই সতর্ক। পাশাপাশি তাঁদের নিয়ে শয়তানের সার্বক্ষণিক চক্রান্ত প্রসঙ্গেও সচেতন করেছিলেন আল্লাহ তায়ালা। তিনি বলেছিলেন—

> ‘অতঃপর আমি বললাম—ও হে আদম, এ তোমার ও তোমার স্ত্রীর শত্রু। সুতরাং সে যেন জান্নাত থেকে তোমাদের বের করে না দেয়, তাহলে তোমরা কষ্টে পতিত হবে।’[১৩]

কিছুদিন পর শয়তান আদম ও হাওয়া (আ.)-এর শুভাকাঙ্ক্ষীবেশে ওই বাগানে চলে আসে। সে তাঁদের প্ররোচিত করতে শুরু করে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে।[১৪] শয়তান তাঁদের জানায়, আল্লাহ তাঁদের যে গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, মূলত ওই গাছটি জাদুকরি। তাই তারা ওই গাছের ফল খেলে চিরস্থায়ী জান্নাতি হয়ে যাবে। শয়তান আরও বলে—‘হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেবো অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা?’[১৫]

---

[১২] সূরা নিসা : ১২১
[১৩] সূরা ত্ব-হা : ১১৭
[১৪] সূরা নিসা : ১২০
[১৫] সূরা ত্ব-হা : ১২০

তিনজন অজানা নবি

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—প্রত্যেক নবি তাঁর সম্প্রদায়কে যে বার্তা দিয়েছিলেন এবং জনগণ যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

পৃথিবীতে আগত নবিগণ

ইসলাম আমাদের জানিয়েছে, আল্লাহ তায়ালা প্রতিটি জাতির কাছে নবি ও রাসূল প্রেরণ করেছেন। এর মধ্যে শেষনবি ছিলেন মুহাম্মাদ (সা.), যার মাধ্যমে কোনো একটি গোষ্ঠী বা জাতি নয়; বরং গোটা মানবজাতির জন্য এসেছিল হিদায়াতের বার্তা এবং যে বার্তাগুলো কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সুরক্ষিত।

এ কারণে যখনই আমরা মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগের সময়ের কোনো ধর্ম নিয়ে কথা বলতে যাব, তখন সবকিছুর আগে উক্ত ধর্মটি নির্ভরযোগ্য কোনো নবির মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল কি না, তা জানাও আবশ্যক। আর মুহাম্মাদ (সা.)-এর আগমনের পর অন্য যত ধর্ম প্রবর্তিত হয়েছে, তার সবটাই মিথ্যা ও ভুলে ভরা। কেননা, স্বয়ং নবিজি বলে গেছেন—তাঁর ওফাতের পর এ পৃথিবীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে আর কোনো ওহিও আসবে না, কোনো নবিও আসবে না।

এ কারণেই পুরোনো ইতিহাস বা প্রাচীন কোনো সমাজকে আমরা যখন জানার চেষ্টা করি, তখন আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্যই থাকে উক্ত জাতি বা সমাজ যে আধ্যাত্মিক নির্দেশনাগুলো লাভ করেছিল, তা শনাক্ত করা। তবে মাঝেমধ্যে এমনও হয়—আমরা হয়তো একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের কথা জানতে পারি, তবে সেখানে আগত নবির নাম আর উদ্‌ঘাটন করতে পারি না। তাই অনেক নবির নাম শেষ পর্যন্ত অজানাই রয়ে যায়।

তিনজন অজানা নবি

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা তিনজন নবির কথা বলেছেন, যারা একই সময়ে, একই শহরে প্রেরিত হয়েছিলেন, কিন্তু উক্ত তিন নবির কোনো নাম উল্লেখ করা হয়নি। এ শহরটির নাম-ঠিকানাও আজ অবধি রহস্যাবৃতই রয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার—একজন সাধারণ মানুষ এ তিন নবির মিশনকে নিজের জীবনের মিশন বানিয়ে নিয়েছিলেন। তিনিই স্থানীয় জনগণকে এ তিনজন নবির শিক্ষা অনুসরণ করার জন্য তাগিদ দিয়ে আসছিলেন।

এ শহরটি কি প্রাচীন মায়ান শহর নাকি আফ্রিকার কোনো শহর, নাকি এশিয়া বা উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত কোনো শহর! হতে পারে শহরটি ছিল মিসিসিপি নদীর তীরবর্তী কাহোকিয়া শহর অথবা ছিল নীলনদের তীরবর্তী মিরো শহর কিংবা কোনোটাই নয়।

আমরা দুনিয়াবি জীবনে এ তথ্যগুলো হয়তো কখনোই জানতে পারব না। কিন্তু শহরের পরিচয় জানার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ওই শিক্ষাটি জানা ও লালন করা, যা সাধারণ ওই মানুষটি প্রচার করেছিলেন। যিনি মানুষকে আল্লাহর আনুগত্য করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। এবার চলুন মূল গল্পে ফিরে যাই।

শহরে যারা ছিলেন সঙ্গী

> ‘আপনি তাদের কাছে সে জনপদের অধিবাসীদের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করুন, যখন সেখানে রাসূল আগমন করেছিলেন। আমি তাদের নিকট দুজন রাসূল প্রেরণ করেছিলাম, অতঃপর তারা তাঁদের মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। তখন আমি তাঁদের শক্তিশালী করলাম তৃতীয় একজনের মাধ্যমে।
>
> তাঁরা (নবিগণ) সবাই বলল—“আমরা তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।”
>
> তারা (অধিবাসী) বলল—“তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ, রহমান আল্লাহ কিছুই নাজিল করেননি। তোমরা কেবল মিথ্যাই বলে যাচ্ছ।”
>
> রাসূলগণ বলল—“আমাদের রব জানেন, আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি প্রেরিত হয়েছি। পরিষ্কারভাবে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দেওয়াই আমাদের দায়িত্ব।”
>
> তারা বলল—“আমরা তোমাদের অশুভ-অকল্যাণকর দেখছি। যদি তোমরা বিরত না হও, তবে অবশ্যই তোমাদের পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করব এবং আমাদের পক্ষ থেকে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে।”
>
> রাসূলগণ বলল—“তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের সাথেই! এটা কি এজন্য যে, আমরা তোমাদের সদুপদেশ দিয়েছি? বস্তুত তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় ছাড়া অন্য কিছু নও।”
>
> (এরপর পরিস্থিতি এমন গেল যে, নবিগণ দীর্ঘদিন দাওয়াতি কাজ করার পরও তেমন কোনো সাড়া পেলেন না; বরং লোকজন তাঁদের কর্কশভাবে প্রত্যাখ্যান করা অব্যাহত রাখল।) অতঃপর শহরের প্রান্তভাগ থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো। সে বলল—“হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রাসূলগণের অনুসরণ করো। অনুসরণ করো তাঁদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না, অথচ তাঁরা সুপথপ্রাপ্ত।”

ইউসুফ (আ.)-এর গল্প

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—ইউসুফ (আ.) আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত হয়ে যেভাবে তাঁর চারপাশের পরিস্থিতিকে অনুকূলে আনতে পেরেছিলেন।

কে ছিলেন ইউসুফ (আ.)

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে খুবই চমৎকারভাবে ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনার বর্ণনা করেছেন। যে কেউ এ গল্প পাঠ করে স্বাভাবিকভাবেই বিমোহিত হবে। একজন মানুষ তার ঈমানের পরীক্ষায় বারবার যেভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন, তা আমাদের জন্য বড়োই শিক্ষণীয়। প্রশ্ন হলো—কে এই ইউসুফ (আ.)? কোথা থেকেই-বা হয়েছিল তাঁর আগমন? ধারণা করা হয়, খুব সম্ভবত তাঁর সময়টি হবে খ্রিষ্টপূর্ব ১৬ শতাব্দী।

ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র ইসহাক, যিনি শেষ পর্যন্ত ফিলিস্তিনেই থেকে গিয়েছিলেন, তাঁর একটি পুত্র সন্তান ছিল, যার নাম—ইয়াকুব (আ.)। ইয়াকুব (আ.)-এর ছিল ১২ ছেলে এবং অনেকগুলো কন্যা সন্তান। সেই ১২ ছেলের মধ্যে একজন ছিলেন ইউসুফ (আ.)। তিনি ও তাঁর ছোটো ভাই বনি ইয়ামিন ছিলেন একই মায়ের সন্তান। আর বাকি ১০ ছেলের মা ছিলেন অন্য এক নারী।

আল কুরআনের এত চমৎকার বর্ণনা থাকার পরও তা বাদ দিয়ে অন্য কোনো উৎস থেকে ইউসুফ (আ.)-এর গল্প বলা অর্থহীন। তাই আল কুরআনে সূরা ইউসুফ থেকেই আমরা এই নবির ঘটনাসমূহ জানার চেষ্টা করব।

অদ্ভুত এক স্বপ্ন

‘আমি আপনার নিকট উত্তম কাহিনি বর্ণনা করেছি, ঠিক যেভাবে আমি এ কুরআন আপনার নিকট অবতীর্ণ করেছি। আপনি এর আগে অবশ্যই এ ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না।’[১৬]

‘যখন ইউসুফ পিতাকে বলল—“পিতা, আমি স্বপ্নে দেখেছি ১১টি নক্ষত্র। সূর্য ও চন্দ্রকে। আমি তাদের আমার উদ্দেশে সিজদা করতে দেখেছি।” তিনি (ইয়াকুব) বললেন—“বৎস, তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না, তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়

[১৬] সূরা ইউসুফ : ৩

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" এমনিভাবে তোমার পালনকর্তা তোমাকে মনোনীত করবেন এবং তোমাকে বাণীসমূহের নিগূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দেবেন এবং তোমার প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন আর ইয়াকুব পরিবার-পরিজনের প্রতি; যেমন ইতঃপূর্বে তোমার পিতৃপুরুষ ইবরাহিম ও ইসহাকের প্রতি পূর্ণ করেছেন। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তা অত্যন্ত জ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।'[১৭]

'ইউসুফ ও তাঁর ভাইদের কাহিনিতে জিজ্ঞাসুদের জন্য নিদর্শনাবলি রয়েছে।'[১৮]

'যখন তারা বলল—"অবশ্যই ইউসুফ ও তার ভাই আমাদের পিতার কাছে আমাদের চাইতে অধিক প্রিয় অথচ আমরা একটা সংহত শক্তিবিশেষ। নিশ্চয় আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তিতে রয়েছেন। হত্যা করো ইউসুফকে কিংবা ফেলে এসো তাঁকে অন্য কোনো স্থানে। এতে শুধু তোমাদের প্রতিই তোমাদের পিতার মনোযোগ নিবিষ্ট হবে এবং এরপর তোমরা যোগ্য বিবেচিত হয়ে থাকবে।" তাদের মধ্য থেকে একজন বলল—"তোমরা ইউসুফকে হত্যা করো না; বরং ফেলে দাও তাঁকে অন্ধকূপে, যাতে কোনো পথিক তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে যায়।"'[১৯]

'(ভাইয়েরা সবাই এ পরিকল্পনায় সম্মত হওয়ার পর পিতার কাছে চলে গেল এবং ইউসুফকে নিয়ে একদিন বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করল) তারা বলল—"পিতা, ব্যাপার কি! আপনি ইউসুফের ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস করেন না? আমরা তো তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষী। আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে যেতে দিন। সেখানে সে তৃপ্তিসহ খাবে, খেলাধুলা করবে এবং আমরা অবশ্যই তাঁর রক্ষণাবেক্ষণ করব।"

পিতা বললেন—"আমার দুশ্চিন্তা হয় যে, তোমরা তাকে নিয়ে যাবে এবং আমি আশঙ্কা করি—নেকড়ে তাকে খেয়ে ফেলবে এবং তোমরা তার দিক থেকে গাফেল থাকবে।"

তারা বলল—"আমরা একটি ভারী দল থাকা সত্ত্বেও যদি নেকড়ে তাকে খেতে আসে, তাহলে আমাদেরই বরং আগে খেতে হবে।"'[২০]

'অতঃপর তারা যখন তাকে নিয়ে চলল এবং অন্ধকূপে নিক্ষেপ করতে একমত হলো এবং আমি তার অন্তরকে জানিয়ে দিলাম, তুমি একদিন তাদের এ অন্যায়ের কথা বলবে এমন অবস্থায়—তারা তোমাকে চিনবে না।'[২১]

---

[১৭] সূরা ইউসুফ : ৫-৬
[১৮] সূরা ইউসুফ : ৭
[১৯] সূরা ইউসুফ : ৮-১০
[২০] সূরা ইউসুফ : ১১-১৪
[২১] সূরা ইউসুফ : ১৫

নীল নদ থেকে মরুভূমি

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—যেভাবে মুসা (আ.) মিশরের লোকদের কাছে দাওয়াত দিয়েছিলেন।

হিব্রুদের দাসত্ব

ইউসুফ (আ.)-এর পুরো গোত্রটাই পরবর্তী সময়ে একটা সময়ে উন্নত জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে মিশরে অভিবাসন করে চলে এসেছিল। প্রথমদিকে মিশরের তৎকালীন শাসকরা তাদের স্বাগতই জানিয়েছিলেন। কিন্তু এই শাসকদের অনেকেই মিশরের মাটির সন্তান ছিলেন না। তারা ছিলেন বাইর থেকে আসা কিছু দখলদারমাত্র। যদিও এই দখলদারদের মেয়াদ খুব বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

যখন মিশরের নাগরিকরা হিকসস গোত্রকে উৎখাত করে পুনরায় স্বজাতীয় ফারাওদের (ফেরাউন) শাসক বানিয়ে নেয়, তখন থেকে অভিবাসীরা নানা ধরনের সংকটের মুখে পড়তে থাকে। অভিবাসীরা নিজেদের হিব্রু বলে দাবি করত। হিব্রু শব্দটির অর্থ হলো—অন্য পারের লোক। যেহেতু তাদের আদি পিতা ইবরাহিম (আ.) বহু বছর আগে ইউফ্রেটিস নদীর অপর পার থেকে এসে ফিলিস্তিনে বসতি গড়েছিলেন, তাই তারা নিজেদের এ নামে অভিহিত করতেন।

মিশরীয় অনেকেই এসব ফিলিস্তিনিকে নিজেদের দেশে উটকো বলেই মনে করত। এভাবে অনেক শতাব্দী পার হয়ে যাওয়ার পর ইউসুফ (আ.) এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা আস্তে আস্তে নিজেদের অবস্থান ও অধিকার হারাতে থাকে। অবশেষে খ্রিষ্টপূর্ব ১৫শ শতকের দিকে তাদের মিশরে শ্রমিক হয়ে যেতে হয়, যেন তারা রাষ্ট্রের ক্রীতদাস। এভাবে হিব্রুরা একটি শোচনীয় পর্যায়ে চলে যায়। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল। পূর্বপুরুষদের মধ্যে যারা আল্লাহর অনুসরণ করতেন, তারাও চলে যায় বিস্মৃতির অন্ধকারে। হিব্রুরা ধীরে ধীরে মিশরীয় সংস্কৃতিতে নিজেদের মানিয়ে নিতে শুরু করে। ফলে তারা উপাসনা করতে থাকে নানা দেব-দেবীর মূর্তিও। ভালো, কল্যাণকর ও নৈতিক জীবন নিয়ে তাদের মাঝে আর কোনো ধারণাই অবশিষ্ট ছিল না।

যদিও মিশরীয়রা কখনোই হিব্রুদের আপন করে নিতে পারেনি, তারপরও মিশরের জনগণের সাথে তারা ক্রমাগত মিশে গিয়েছিল। এভাবে খ্রিষ্টপূর্ব ১২ শতকের দিকে এসে মিশরীয়রা লক্ষ করল, মিশরের মাটিতে হিব্রু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা উদ্‌বেগজনকভাবে অনেকটাই বেড়ে গেছে। তখন হিব্রু জনগোষ্ঠীর ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে কমিয়ে আনার জন্য মিশরীয়রা একটি বর্বর নিয়ম চালু করল।

ফারাওদের পক্ষ থেকে ঘোষণা এলো–এখন থেকে হিব্রুদের ঘরে যত শিশু জন্মাবে, সকলকেই হত্যা করা হবে।[২২]

মিশরীয়রা এভাবেই তাদের বর্বর কার্যক্রম চালাতে থাকলে হিব্রুরা সাধ্যমতো এর প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু সেনাদের সমরাস্ত্রের কাছে তারা ছিল নিতান্তই অসহায়। এই সেনারা হিব্রুদের ঘরে ঘরে যেত এবং তাদের অমানবিক শাসকগোষ্ঠীর হুকুম তামিল করত।

বাক্সবন্দি শিশু

কিন্তু এ বর্বর শাসকদের অমানবিক পরিকল্পনার বিপরীতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ছিল চমৎকার একটি পরিকল্পনা। তিনি খুবই অভিনব উপায়ে একজন হিব্রু মায়ের ওপর ওহি নাজিল করলেন। সেখানে উক্ত মাকে একটি নির্দেশনাও দেওয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন—

> ‘মুসার জননীর কাছে ওহি পাঠালাম, শিশুটিকে স্তন্যদান করো। যখন তুমি এর সম্পর্কে কোনো আশঙ্কা করবে, তখন একে (নীল) দরিয়ায় ভাসিয়ে দাও এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। নিশ্চয় আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং একে একজন রাসূল করব।’[২৩]

এরপর যখন ফেরাউনের সেনারা তাঁর গ্রামে প্রবেশ করল, তখন মুসা (আ.)-এর মা তাঁর নবজাতক শিশুকে নলখাগড়ার একটি ঝুড়িতে/বাক্সে ভরে দিলেন। তারপর নদীর তীরে গিয়ে তিনি বাক্সটিকে ভাসিয়ে দিলেন নদীর পানিতে। এই মহীয়সী জননী চোখভরা অশ্রু রেখেই নিজের বুকের ধনকে ছেড়ে দিলেন অনিশ্চিত গন্তব্যে। একটু ভাবুন তো, এ রকম একটি অবস্থায় একজন মায়ের কেমন লাগতে পারে! আল্লাহ তখন মাকে জানালেন, এই সন্তানকে তিনিই হেফাজত করবেন।[২৪]

আল্লাহর পরিকল্পনা অনুযায়ী নদীর স্রোতে বাক্সটিকে ভাসিয়ে নিয়ে ফেরাউনের প্রাসাদের সন্নিকটে চলে এলো। ফেরাউনের স্ত্রী, যাকে আমরা আসিয়া (আ.) বলে জানি, তিনি এ বাক্সটি দেখে অবাক হলেন এবং তাঁর কাছে নিয়ে আসার জন্য অধীনস্থদের আদেশ প্রদান করলেন।[২৫]

---

[২২] সূরা ইবরাহিম : ৬
[২৩] সূরা কাসাস : ৭
[২৪] সূরা ত্ব-হা : ৩৯
[২৫] সূরা কাসাস : ৮

দুই শিংয়ের অধিকারী

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—জুলকারনাইন প্রতিটি ঘটনায় যেভাবে প্রতিক্রিয়া দেখাতেন।

প্রাচীর মানব জুলকারনাইন

অতীতের একজন অদ্ভুত শাসক সম্পর্কে আল কুরআনের ১৮ নং সূরা আল কাহফে চমৎকার কিছু বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন প্রজ্ঞাবান এক শাসক। আরবি জুলকারনাইন শব্দের অর্থ—দুই শিংয়ের অধিকারী। এই নামকরণের সার্থকতা হলো—তাঁর সাম্রাজ্যটি দুটো বিশাল ভূখণ্ডের সমন্বয়ে তৈরি হয়েছিল আর এ ভূখণ্ড দুটির আকৃতি ছিল অনেকটা শিংয়ের মতো।

কুরআনে এই শাসকের কথা উল্লিখিত হওয়ায় মুসলিম স্কলাররা তাঁর প্রকৃত পরিচয় জানার ও নির্ণয় করার অনেক চেষ্টা করেছেন। তবে তারা কেউ এখনও চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে সম্মত হতে পারেননি। কেউ কেউ বলেন, তিনিই হলেন আলেকজান্ডার দ্যা গ্রেট; যিনি বেঁচে ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব ৩৫৬ সাল থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৩ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ, আলেকজান্ডার ছিলেন মূর্তিপূজারি এবং তার বিরুদ্ধে সমকামিতার অভিযোগও রয়েছে।

অন্যদিকে আল কুরআনে জুলকারনাইন নামের যে শাসকের কথা বলা হয়েছে, তিনি ছিলেন নেককার এবং আল্লাহভীরু এক শাসক। এটুকুই আমরা জানতে পেরেছি, তিনি শিং আকৃতির বিশাল ভূখণ্ড শাসন করতেন। বার্বারিয়ানদের হাত থেকে নিজ জাতিকে রক্ষা করার জন্য একটি বিশাল দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন বলেও জানা যায়।

আজকের সময়ে এসে গবেষকগণ আবার দাবি করছেন—এ শাসকটিই হলেন পারস্যের শাসক সাইরাস, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৯ সালে এ অঞ্চলটি শাসন করেছেন। তিনি প্রথম লিদিয়ানদের পরাজিত করেছিলেন। লিদিয়ার অবস্থান ছিল বর্তমান তুরস্কের আওতায়। এরপর তিনি চালডিয়ানসদেরও পরাজিত করেছিলেন এবং সেখানে ইহুদিসহ আরও যত বন্দি ছিল, সবাইকেই নিজ নিজ দেশে ফেরার সুযোগ করে দিয়েছিলেন।

এরপর তিনি মধ্য এশিয়ার বিরাট ভূখণ্ড জয় করেন। এভাবে তাঁর অধীনস্থ পুরো এলাকাটির আকৃতি জোড়া শিংয়ের মতো হয়ে যায়। খ্রিষ্টপূর্ব ৫২৯ সালে পূর্বাঞ্চল থেকে আসা একটি দুর্ধর্ষ

বেদুইন বাহিনীর হাতে তার মৃত্যু হয়। তাঁর শাসনামলে তিনি নিজেকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তিনি প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ন্যায়ের মানদণ্ড বহাল রাখতেও পেরেছিলেন। তাঁর ঘটনাটি আমাদের সকলের জানা দরকার। জুলকারনাইনের ঘটনাবলি থেকে আমরা আল্লাহকে ভয় করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন হতে পারব। পাশাপাশি একজন মানুষের হাতে যদি ক্ষমতা ও দায়িত্ব চলে আসে, তাহলে কীভাবে তিনি ইনসাফের সাথে তা প্রয়োগ করতে পারেন, তাও শিখতে পারি।

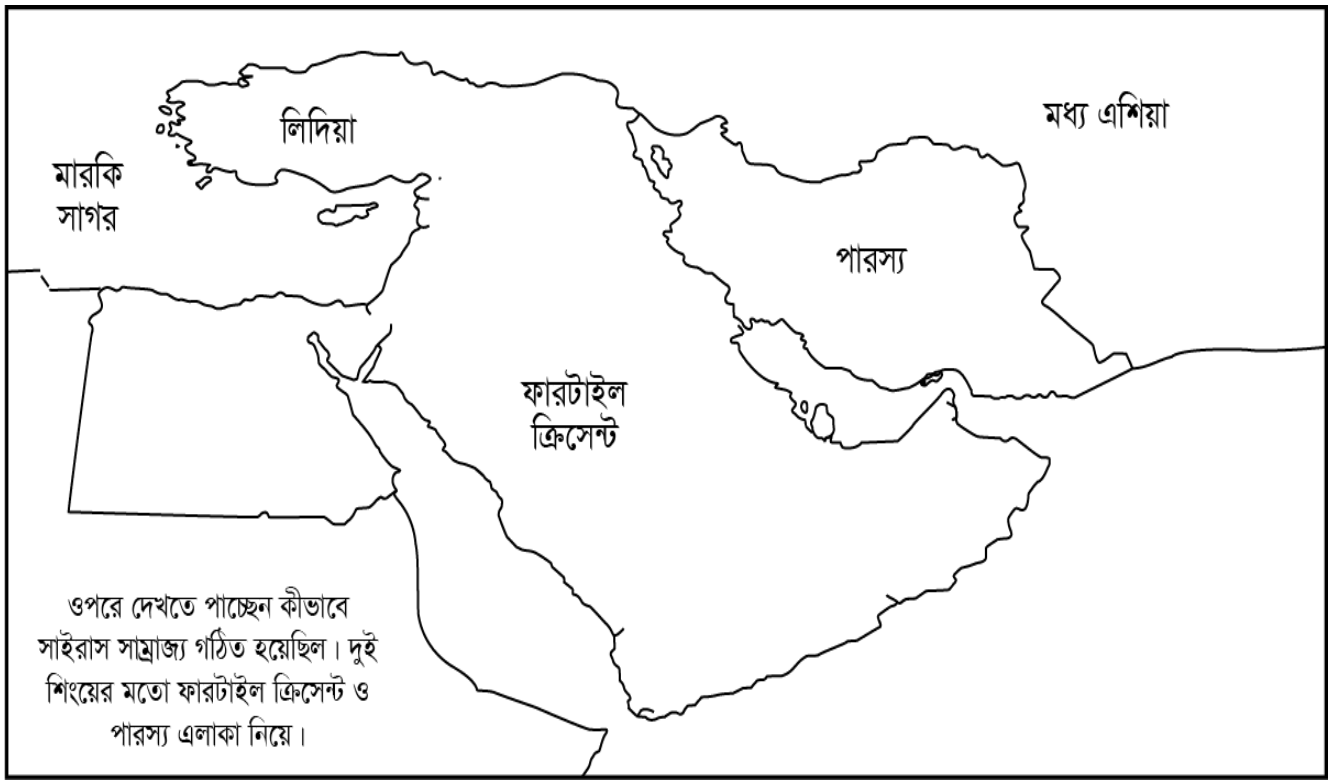

জুলকারনাইনের পরীক্ষা

মদিনার ইহুদিরা নানাভাবে নবি মুহাম্মাদ (সা.)-কে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছিল। তারা নবিজিকে এমন কিছু বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যেগুলো হয়তো তাঁর অজানাই ছিল। ইহুদিদের এসব প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল লোকজনের সামনে নবিজিকে বিব্রত ও তাঁর নবুয়তকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। কিন্তু আল্লাহ তো ছিলেন অবশ্যই তাঁর সঙ্গে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই নবিজিকে ওহির মাধ্যমে প্রকৃত তথ্যগুলো জানিয়ে দিতেন। নবিজি সেগুলোই বলতেন আর ইহুদিরাও তখন ভড়কে যেত। কারণ, তারা যে উত্তরটি জানত, রাসূল (সা.) হুবহু তাদের তা-ই শুনিয়ে দিতেন। এ রকমই একটি দৃষ্টান্ত হলো জুলকারনাইনের গল্প। আল্লাহ বলেন—

> ‘তারা (ইহুদিরা) আপনাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলুন, আমি তোমাদের কাছে তাঁর কিছু অবস্থা বর্ণনা করব।’[২৬]

[২৬] সূরা কাহাফ : ৮৩

‘আমি তাঁকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম এবং সর্বত্র ভ্রমণের সক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছিলাম। অতঃপর তিনি তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে একদিকে অগ্রসর হলেন। যখন তিনি সূর্যের অস্তাচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশয়ে অস্ত যেতে দেখলেন।’[২৭]

মুসলিম গবেষকগণ মনে করছেন, পঙ্কিল জলাশয় বলতে তুরস্কের সমুদ্র উপকূলকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এই অঞ্চলের সমুদ্রতীরে কালচে ভাব রয়েছে। আবার কেউ কেউ এশিয়া মাইনর অঞ্চলের অখরিডা লেকের কথাও বলেছেন। এই লেকটি পার্শ্ববর্তী একটি ঝরনা থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এই লেকটির পানিও কালো এবং পঙ্কিল ধরনের। জুলকারনাইন এ কালো পানিতে সূর্য অস্ত যেতে দেখে সেখানেই ক্যাম্প করলেন। তারপর তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলো বিশেষ এক জনগোষ্ঠীর।

‘তিনি সেখানে এক সম্প্রদায়কে দেখতে পেলেন।

আমি বললাম—“হে জুলকারনাইন! আপনি তাদের শাস্তি দিতে পারেন আবার তাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণও করতে পারেন।”

জুলকারনাইন বললেন—“যে কেউ সীমালঙ্ঘনকারী হবে, আমি তাকে শাস্তি দেবো।” অতঃপর তিনি তাঁর রবের কাছে ফিরে যাবেন। তিনিও তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। আর যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তার জন্য প্রতিদান রয়েছে কল্যাণ এবং আমার কাজে তাকে সহজ নির্দেশ দেবো।’[২৮]

জুলকারনাইনের প্রথম পরীক্ষা ছিল এ সম্প্রদায়ের মানুষগুলো। কারণ, তাদের ছিল না কোনো আইন-শৃঙ্খলা বা বিধিবিধান। খুব সম্ভবত এরা ছিল লিডিয়ানস। জুলকারনাইন এ জনপদে আইন প্রণয়ন করে ওই আইনের মাধ্যমেই তাদের শাসন করার সিদ্ধান্ত দিলেন। এরপর তিনি আবার চলতে শুরু করলেন এবং সূর্যোদয়ের একটি স্থানে গিয়ে থামলেন। অর্থাৎ, এশিয়া মাইনর (তুরস্ক) থেকে শুরু করে মধ্য এশিয়া হয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন আরও পূর্ব দিকে।

‘অবশেষে তিনি যখন সূর্যের উদয়াচলে পৌঁছলেন, তখন তিনি তাকে এমন এক সম্প্রদায়ের ওপর উদয় হতে দেখলেন, যাদের জন্য সূর্যতাপ থেকে আত্মরক্ষার কোনো আড়াল আমি সৃষ্টি করিনি। প্রকৃত ঘটনা এমনই। তার বৃত্তান্ত আমি সম্যক অবগত আছি।’[২৯]

---

[২৭] সূরা কাহাফ : ৮৪-৮৫

[২৮] সূরা কাহাফ : ৮৬-৮৮

[২৯] সূরা কাহাফ : ১৮-৯১

গুহায় ঘুমন্ত যুবকেরা

এই আলোচনায় ফোকাস করা হয়েছে—যুবকেরা তাদের নতুন পৃথিবীতে ভিন্ন যে সকল বিষয় দেখেছিল।

একনজরে খ্রিষ্টান বিশ্ব

ঈসা (আ.)-এর জীবদ্দশায় কেবল ফিলিস্তিনে বসবাসরত ইহুদিরাই তাঁর প্রচারিত ধর্ম ও শিক্ষার বিরোধিতা করেছিল। এর পেছনে কারণ ছিল দুটো। একটি অংশ বিরোধিতা করেছিল নিজেদের ক্ষমতা ও আধিপত্য হারানোর ভয়ে আর অপরটি ছিল সংস্কারবিরোধী। তারা মূলত পূর্ববর্তী প্রথা ও আচারকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করত।

ঈসা (আ.)-এর অন্তর্ধানের পর তাঁর অনুসারীরা বিশ্বের নানা স্থানে এ ধর্মীয় বার্তাকে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করল। এদের মধ্যে বারনাবাস ও থমাস নামেও দুটো গোষ্ঠী ছিল, যারা ঈসা (আ.)-এর জীবনের ওপর লেখা বর্ণনাগুলোকে অগ্রাহ্য করে বরং তারা প্রাথমিক অবস্থায় যেভাবে ধর্মকে পেয়েছিল, সেভাবে অনুশীলন করতেই বেশি আগ্রহী।

কিন্তু পল বা লিউকের মতো যারা নতুন করে ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তারা বরং ধর্মের মূল বিধানে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংস্কার আনতে চেয়েছিল। তারা ধর্মকে তুলনামূলক সহজ করে মানুষের কাছে বেশি আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য মরিয়া হয়েছিল। তাই একটিবারের জন্যও অনুধাবন করেনি, নিজেদের মনগড়া চিন্তাকে ধর্মীয় শিক্ষা বা ধর্মীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার গর্হিত কাজ। তারা অনুভব করেনি, ঈসা (আ.)-এর প্রচারিত বার্তায় পরিবর্তন আনার কোনো অধিকারও তাদের নেই।

খ্রিষ্টাব্দ ৪০ থেকে ১৫০ সন পর্যন্ত সময়ে গোটা রোমান সাম্রাজ্যজুড়ে খ্রিষ্টানদের মধ্যে নতুন নতুন অনেক গ্রুপের জন্ম হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ পলের প্রচারিত শিক্ষাগুলো অনুসরণ করত, আবার কেউ-বা ভিন্ন কিছু। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, গ্রিক প্রভাবিত বেশ কিছু অঞ্চলে এবং ইতালিতে যেসব খ্রিষ্টান থাকত, তারা ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করত এবং ঈশ্বরের একজন পুত্র আছে বলেও বিশ্বাস করত।

পাশাপাশি তারা জুপিটার, হারকিউলিস ও পৌরাণিক আরও কিছু নামে বিশ্বাস রাখত। এ কারণে ঈশ্বরের মনুষ্য পুত্রের ধারণা বিশ্বাস করতে তাদের অস্বস্তি হয়নি। গ্রিক প্রভাবিত এ জাতিগোষ্ঠীর নাম ছিল ত্রিনিটারিয়ানস। অন্যদিকে, যেসব খ্রিষ্টান ঈসা (আ.) ও তাঁর সহচরদের প্রচারিত শিক্ষার

কাছাকাছি ধারণাগুলো লালন করতেন, তারা উত্তর আফ্রিকা, ফিলিস্তিন ও সিরিয়ায় বসতি গড়ে। এই খ্রিষ্টানদের বলা হয় ইউনিটারিয়ানস অথবা একেশ্বরবাদী।

রোমানদের আগ্রাসী মনোভাব

প্রথমদিকে খ্রিষ্টান বা খ্রিষ্টধর্ম নিয়ে রোমানদের তেমন কোনো মাথাব্যথা ছিল না। কেননা, তাদের ভূখণ্ডে বিগত হাজার বছর ধরেই নানা ধর্মের লোকজন বাস করে আসছিল। তাই আলাদা করে খ্রিষ্টানদের নিয়ে তারা নেতিবাচক কিছু ভাবেনি। কিন্তু খ্রিষ্টধর্ম যখন সাম্রাজ্যে ছড়াতে থাকে, খ্রিষ্টধর্মের প্রতিটি সংস্করণই যখন ব্যাপকহারে মানুষকে কাছে টানতে থাকে, তখন রোমান শাসকরা এ বিষয়ে গুরুত্বারোপ করতে বাধ্য হয়। খ্রিষ্টান ধর্ম নিয়ে রোমানদের সংকটের মূল কারণ ছিল, এ ধর্মটি মানুষকে অদেখা বা অদৃশ্য একজন প্রভুর ইবাদত করার কথা বলে।

ফলে খ্রিষ্টানেরা রোমান সম্রাটকে মানতে চাইত না। অথচ রোমান সমাজ কাঠামোর মূল ভিত্তি ছিল—রোমান সম্রাটই পৃথিবীর প্রভু। তাই সকলকেই রোমান সম্রাটেরই ইবাদত করতে হবে। এটুকু মেনে নিলে তারপর প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মের বিধানগুলো মানতে পারবে। কিন্তু রোমান সম্রাটের প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করে ধর্ম পালনের কোনো সুযোগ ছিল না তখনও।

কিন্তু খ্রিষ্টানেরা, বিশেষ করে ইউনিটারিয়ানস ও ত্রিনিটারিয়ানস কেউই রোমান সম্রাটকে প্রভুর আসনে মানতে রাজি ছিল না। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে এ বিষয়টিকে বিবেচনা করা হতো গুরুতর অপরাধ হিসেবে। এমনকি খ্রিষ্টানদের অন্যতম প্রচারক পলকেও শুধু এ কারণেই রোমান সম্রাট সিজারের কাছে আটক করা হয়। দুই বছর কারাবাসের পর তিনি মুক্ত হয়েছিলেন।

একটা সময়ে রোমান অধিপতির পক্ষ থেকেই খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অপপ্রচার এবং খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে নির্যাতন শুরু হয়। বন্ধ করে দেওয়া হয় চার্চগুলো, খ্রিষ্টান নেতাদের আটক করে তাদের সম্পত্তি করা হয় বাজেয়াপ্ত। ২৫০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে এসে শুরু হয় খ্রিষ্টানদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করার সংস্কৃতি। এমনকি রোমান নাগরিকদের বিনোদন দেওয়ার জন্য নানা ধরনের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় খ্রিষ্টানদের সিংহের খাবার হিসেবে ব্যবহার করার প্রচলন শুরু হয়ে যায়।